Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
***Impact Factor: 6.28** (Index Copernicus International)*
Volume-X, Issue-I, October 2021, Page No.54-62
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

দুঃখ ও কর্মবাদ

ইন্দ্রাণী সেন
অ্যাসিস্টান্ট প্রফেসর, দর্শন বিভাগ , করিমপুর পান্নাদেবী কলেজ, নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ

Abstract:

Duḥkha is an important concept in Indian ethics which often translated as suffering, pain, unhappiness etc. In this mortal world no one is enjoying a continuous pleasure and everyone is suffering from duḥkha. According to Indian philosophers, suffering is an inescapable and integral part of life. The main aim of Indian philosophy salvation, i.e. mokṣa falls futile except the concept of Duḥkha, as except the presence of duḥkha no one would crave for mokṣa, i.e. mukti. My paper tries to demonstrate 1) what does duḥkha mean according to Nyāya school of philosophy? 2) why does a soul born on earth and why does it suffer? In this context the discussion on the doctrine of karma, i.e. karmavāda naturally comes and it also includes the concept of reincarnation, i.e. janmāntaravāda. The objective of the paper also includes 3) how duḥkha leads one to salvation? 4) And if so happens, then can we say that our bad deeds, which lead us to duḥkha, help us to get salvation?

Keywords:

1) Suffering (Duḥkha), 2) Doctrine of Karma (karmavāda), , 3) Doctrine of reincarnation (janmāntaravāda), 4) Abstinence (Vairāgya), 5) Duty for the sake of duty (Niṣkama kārma).

জরা-মরণ সম্পৃক্ত এই জগতে জীব মাত্রই দুঃখ-পঙ্কে নিমজ্জিত। জগতে তাবৎ বিষয় বা ব্যক্তির প্রতি আমাদের যে ভালোবাসা, তা আসলে আসক্তি। এই আসক্তির বশবর্তী হয়েই আমরা যাবতীয় সম্পর্কে আবদ্ধ হয়ে পড়ি। সেই সম্পর্ক জড় বস্তুর সাথে হতে পারে, আবার অজড় ব্যক্তি বা প্রাণীর সাথে হতে পারে। কিন্তু জগতে এমন কোন সম্পর্ক নেই যা আমাদের খাঁটি সুখ দিতে পারে। খুব প্রিয় বস্তুর বিনাশে দুঃখ আদরের পোষা প্রাণীটির শারীরিক অসুস্থতায় বা তার বিয়োগে দুঃখ, ভালোবাসার মানুষের সাথে বিচ্ছেদে বা জীবনবিয়োগে এমনকি তাদের সামান্য অবহেলাতেও আমাদের দুঃখের শেষ নেই। সুতরাং, ব্যবহারিক জীবনে দুঃখ থাকবেই। অর্থাৎ সংসারে সব সুখই দুঃখ মিশ্রিত "মধু-বিষ-সম্পৃক্তম অন্নম্ অত্র উদাহরণম"। এই প্রবন্ধের মূল আলোচ্য বিষয় হল, কেন মানুষ পদে পদে দুঃখ পায়? এই বিষয়টি ব্যাখ্যার জন্য প্রথমেই দুঃখ কী এ বিষয়ে ন্যায়দর্শনসম্মতভাবে একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেছি। যদি আমরা ভারতীয় দর্শনের দিকে দৃষ্টিপাত করি তাহলে দেখি চার্বাক ছাড়া অন্যান্য দর্শনে কর্মবাদ স্বীকার করা হয়েছে। কর্মবাদ অনুসারে, কর্ম মাত্রই ফলপ্রদায়ী। কোন বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য জীবের স্বেচ্ছায় যে প্রচেষ্টা বা প্রবৃত্তি

হয়, তাকেই কর্ম বলে। কর্ম না করে জীব এক ক্ষণও থাকতে পারে না। বস্তুতঃ কর্মই জীবের বন্ধন ও দুঃখের কারণ। জীবের সৎকর্ম থেকে পুণ্য এবং পুণ্য থেকে সুখ, অন্যদিকে অসৎকর্ম থেকে পাপ এবং পাপ থেকে দুঃখ উৎপন্ন হয়। এই কর্মফলভোগের জন্যই জীব বারবার জগতে আসে, আর দুঃখভোগ করে। প্রসঙ্গতঃ কর্মবাদের আলোচনাও স্বাভাবিকভাবে চলে এসেছে। এখানে মূলতঃ যোগদর্শনসম্মতভাবে কর্মবাদের আলোচনা করেছি। আবার, ন্যায়াদি দর্শনে বলা হয়েছে, দুঃখই জীবের মধ্যে বৈরাগ্যের উদ্রেক করে মুক্তির কারণ হয়ে থাকে। কিন্তু প্রশ্ন হয় যে, জীবের দুঃখই যদি জীবের মুক্তির পথ প্রশস্ত করে, তাহলে কী পাপ জীবের মুক্তির পথ দেখায়? কিন্তু তা যে যথার্থ নয়, এটাও প্রতিপাদন করার চেষ্টা করেছি এই প্রবন্ধে।

(১)

'দুঃখ', 'জ্বালা', 'বেদনা', 'যন্ত্রণা', 'তাপ', 'কষ্ট', 'ব্যথা ইত্যাদি শব্দগুলির কোনটিই হুবহু অন্যটির প্রতিশব্দ না হলেও প্রত্যেকটিই দুঃখবাচক শব্দ। আমরা সাধারণতঃ মনে করি, দুঃখ মানেই তা মানসিক; কিন্তু ব্যাপক অর্থে দুঃখ শারীরিকও। জ্বালা যন্ত্রণা মনের যেমন হয়, শরীরেও হয়। মনোকষ্ট যেমন বলি, তেমনই খুব খিদে পেলে আমরা বলে থাকি খিদেয় পেট জ্বলছে। আবার বলি মাথার যন্ত্রণা করছে। তবে শব্দের প্রয়োগ যেভাবেই হোক না কেন প্রতিটিই দুঃখবাচক। আপাতদৃষ্টিতে 'দুঃখ' মানসিক বলে মনে হলেও ব্যাপক অর্থে শারীরিক এবং মানসিক উভয়ই। কারণ, দুঃখ এমনই একটি অনুভূতি যা অনুভূত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমরা বুঝি যে, সেটা আমরা চাই না। দুঃখ শারীরিক হোক বা মানসিক, আকস্মিক হোক বা পূর্বনির্ধারিত, ক্ষণিক হোক বা দীর্ঘস্থায়ী, আঘাতজনিত হোক বা কোন প্রিয়বস্তুর বিচ্ছেদে হোক, বা কোন প্রয়োজনীয় বিষয়ের অভাবজনিত হোক সব রকমের দুঃখেরই স্বরূপ এক। এটি আমাদের কাছে অবাঞ্ছিত বলে প্রতিভাত হয় বলে আমরা সবসময়ই চাই এটা না হলে ভালো হতো বা 'কখন এই অনুভবটি বন্ধ হবে' অথবা 'এটি চলে যাক'। তাই ন্যায়দর্শনে দুঃখকে প্রতিকূলবেদনীয় বলা হয়েছে। সুতরাং, "দুঃখটা দুঃখই নয়"[১] যদি না সেটা থেকে বেরোবার একটা ছটফটানি আমাদের মধ্যে থাকে। দুঃখ থেকে পরিত্রাণ পেতে আমরা সবাই মরিয়া হয়ে থাকি।

ন্যায়দর্শনের মুখ্য প্রতিপাদ্য বিষয় হল প্রমাণাদি ষোড়শ পদার্থ। প্রমাণাদি ষোড়শ পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান থেকে নিঃশ্রেয়স লাভই ন্যায়শাস্ত্রের প্রয়োজন। কাজেই, নিঃশ্রেয়স হল প্রয়োজন এবং প্রমাণাদি ষোড়শ পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান হল ঐ প্রয়োজনের সাধন। দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তিরূপ পরা নিঃশ্রেয়স বা মুক্তির সাক্ষাৎকারণ হল দ্বাদশ প্রমেয় পদার্থের তত্ত্বসাক্ষাৎকার। আত্মাদি প্রমেয় পদার্থ বিষয়ে মিথ্যাজ্ঞানই সংসারের নিদান অর্থাৎ মূলীভূত কারণ এবং সেই মিথ্যাজ্ঞানই সর্ব দুঃখের মূল। কারণ মিথ্যাজ্ঞানবশতঃই অনুকূল বিষয়ের প্রতি আকাঙ্ক্ষারূপ রাগ এবং প্রতিকূল বিষয়ের প্রতি দ্বেষ জন্মায়। অর্থাৎ মিথ্যাজ্ঞানবশতঃ রাগ ও দ্বেষরূপ দোষ উৎপন্ন হয়। সেই সকল দোষবশতঃই মানুষ নানাবিধ পাপকর্ম ও পুণ্যকর্ম সম্পাদন করে ধর্ম ও অধর্ম লাভ করে। তার ফলে নানাবিধ দেহধারণ করে নানাপ্রকার দুঃখভোগ করে। সুতরাং, ঐ সকল মিথ্যাজ্ঞানই সংসারের নিদান এবং সকল প্রকার দুঃখের মূল। আত্মাদি প্রমেয় পদার্থের তত্ত্বসাক্ষাৎকাররূপ তত্ত্বজ্ঞানই ঐ সকল মিথ্যাজ্ঞান নিবৃত্তির দ্বারা মুক্তির সাক্ষাৎকারণ হয়ে থাকে। তত্ত্বজ্ঞান ব্যতীত মিথ্যাজ্ঞানের নিবৃত্তি হতে পারেনা; মিথ্যাজ্ঞানের নিবৃত্তি নাহলে রাগ-দ্বেষাদি দোষের নিবৃত্তি হতে পারেনা; দোষের নিবৃত্তি না হলে ধর্মাধর্মাদিরূপ প্রবৃত্তির নিবৃত্তি হয় না, এবং ফলতঃ জন্মেরও নিবৃত্তি হয়না; জন্মের নিবৃত্তি ব্যতীত আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তিরূপ অপবর্গও অসম্ভব।[২] দুঃখ দ্বাদশ প্রমেয় পদার্থের অন্তর্গত

একাদশ পদার্থ। যে দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তিরূপ অপবর্গ ন্যায়দর্শনের প্রয়োজন, সেই দুঃখের তত্ত্বজ্ঞান লাভও ঐ প্রয়োজনের সহায়ক। বস্তুতঃ যদ্বিষয়ক মিথ্যাজ্ঞান যদ্দুঃখের কারণ, তদ্বিষয়ক তত্ত্বজ্ঞান তদুঃখ নিবৃত্তির কারণ। দুঃখ বিষয়ক তত্ত্বজ্ঞান লাভ হলে তদ্বিষয়ক মিথ্যাজ্ঞান দুরীভূত হবে। দুঃখ বিষয়ক মিথ্যাজ্ঞান এই যে, জীব দুঃখকেও সুখরূপে বোধ করে। আর, দুঃখ বিষয়ক তত্ত্বজ্ঞান হল এই যে, প্রকৃত সুখও দুঃখানুসক্ত হওয়ায় সুখও দুঃখ। দুঃখসম্বন্ধশূন্য কোন জন্ম নেই। তাই দুঃখের উক্ত স্বরূপ মুমুর্ষু বুঝলে তবেই তাঁর দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি হবে। আর দুঃখের এই আত্যন্তিক নিবৃত্তির সাথে অপবর্গ অভিন্ন। মহর্ষি দুঃখের লক্ষণে বলেন, ''বাধনালক্ষণং দুঃখম্।।''[৩] শরীর থেকে ফল পর্যন্ত সকল প্রকার প্রমেয়ই বাধনালক্ষণ, অর্থাৎ দুঃখানুসক্ত হওয়ায় দুঃখ। লক্ষণস্থ 'বাধনা' শব্দের অর্থ দুঃখ। দুঃখ সকল জীবেরই মানসপ্রত্যক্ষসিদ্ধ হওয়ায় সুপরিচিত। তা সকল জীবের প্রতিকূলবেদনীয়। বাধনা, পীড়া, তাপ ইত্যাদি হল পর্যায় শব্দ। এই বাধনা বা দুঃখের সাথে যা অনুষঙ্গবিশিষ্ট বা নিয়তসম্বন্ধবিশিষ্ট, সেই সকলই দুঃখ। দ্বাদশ প্রকার প্রমেয়ের মধ্যে শরীরাদি ফল পর্যন্ত অর্থাৎ শরীর, ইন্দ্রিয়, অর্থ, বুদ্ধি, মন, প্রবৃত্তি, দোষ, প্রেত্যভাব ও ফল এই নয়টি প্রমেয় দুঃখের সাথে নিয়তসম্বন্ধবিশিষ্ট হওয়ায় সেগুলিও দুঃখ। অর্থাৎ দুঃখের অনুষঙ্গরূপ সম্বন্ধ যাতে আছে, তাই দুঃখ। দুঃখের লক্ষণসূত্রে 'লক্ষণ' শব্দের দ্বারা এই অনুষঙ্গরূপ সম্বন্ধই বিবক্ষিত। শরীরে দুঃখের নিমিত্তত্বসম্বন্ধ, ইন্দ্রিয়াদিতে দুঃখের সাধনত্ব সম্বন্ধ, সুখে দুঃখের অবিনাভাব সম্বন্ধ বর্তমান। যা মুখ্য দুঃখ তার সম্বন্ধপ্রযুক্ত সবই দুঃখ এবং সেগুলি হল গৌণদুঃখ।

আবার নব্য নৈয়ায়িক অন্নংভট্ট বলেছেন, দুঃখ হল প্রাণীমাত্রের প্রতিকূলবেদনীয়। এখানে 'প্রতিকূল' শব্দের অর্থ দ্বেষের বিষয়। 'প্রতিকূলবেদনীয়' বলতে বোঝায় অন্য দ্বেষের অনধীন দ্বেষের বিষয়। তবে, দ্বেষবিষয়মাত্র বা দ্বেষমাত্র দুঃখের লক্ষণ হলে সর্পাদিতে ঐ দ্বেষ-বিষয়ত্ব থাকায় লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হত। কিন্তু 'অন্য দ্বেষের অনধীন' - এই বিশেষণ প্রযুক্ত হলে ঐ অতিব্যাপ্তি হয়না, কারণ, সর্পজন্য দুঃখে দ্বেষ আছে বলেই সর্পে দ্বেষ হয়েছে, অন্যথায় সর্পে দ্বেষ হত না। কাজেই, সর্পে দ্বেষ অন্য দ্বেষের (সর্পজন্য দুঃখরূপ দ্বেষের) অধীন। ফলতঃ সর্পে অন্য দ্বেষের অনধীন দ্বেষের বিষয়ত্ব না থাকায় সর্পে দুঃখের লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হয়না। তবে, দ্বেষের অনধীন দ্বেষের বিষয়ত্ব দুঃখের প্রকৃত লক্ষণ নয়, তা দুঃখের স্বরূপবোধক বা পরিচায়কমাত্র। [৪] বরং 'দুঃখী অহম' ইত্যাদি প্রত্যক্ষসিদ্ধ দুঃখত্বজাতিই দুঃখের জাতিঘটিত লক্ষণ।

(২)

ভারতীয় দর্শনে দুঃখ ও কর্মবাদ পরস্পর সাপেক্ষ, কারণ কর্ম মাত্রই ফলপ্রদায়ী। কর্মবাদ হল জীবের নৈতিক নিয়মরূপে এক অমোঘ নিয়ম। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ভারতীয় দর্শনে বিশ্ব জগতে নৈতিক নিয়মরূপে এক অমোঘ নিয়ম স্বীকার করা হয়েছে। যে নিয়মের দ্বারা সমগ্র বিশ্ব-সংসার পরিচালিত হয় বলে বেদে কল্পনা করা হয়েছে, তাকে ঋত বলা হয়ে থাকে। প্রকৃতির ঘটনাবলী, যেমন- সৌরজগতের আবর্তন, দিন-রাত্রি, ঋতুচক্রের পরিবর্তন ইত্যাদি সবই নিয়ন্ত্রিত ঋত-এর দ্বারা। সুতরাং, জগতের সকল শৃঙ্খলার মূলে হল এই ঋত। এইভাবে প্রাকৃতিক ঘটনার মতো জীবের কর্মসমূহও শৃঙ্খলিত ও নিয়ন্ত্রিত। অর্থাৎ, জীবের কর্মসমূহও কার্য-কারণ সম্বন্ধে নিয়ন্ত্রিত। জীবের নৈতিকতার জগতে এই কার্য-কারণবাদই কর্মবাদ নামে পরিচিত। কর্মবাদ অনুসারে, যেমন কর্ম তেমন ফল। জীবের কর্মমাত্রই তার ইচ্ছাপ্রসূত। জীবের ইচ্ছা আবার কামনা বাসনাসম্পৃক্ত। জীবের স্বেচ্ছাকৃত কর্মই নৈতিক মূল্যায়নের বিষয় হতে পারে। এই কারণেই কর্মে জীবের স্বাধীনতা থাকা জরুরী। কর্মের সম্পাদনের ব্যাপারে জীব স্বাধীন না হলে সে তার কর্মের জন্য দায়ী হতে পারে না। সুতরাং, কর্মমাত্রকেই জীবের ইচ্ছাপ্রসূত হতে হবে। তবে, কর্মে জীবের

স্বাধীন ইচ্ছা থাকলেও কর্মের ফলভোগের ক্ষেত্রে জীবের ইচ্ছার কোন গুরুত্ব নেই। অর্থাৎ কর্মফল জীবের ইচ্ছানিরপেক্ষভাবে উৎপন্ন হয়ে থাকে।

কর্মবাদের সাথে আরো একটি মতবাদ অঙ্গাঙ্গি সম্পর্কে জড়িত, সেটি হল জন্মান্তরবাদ। কর্মবাদ স্বীকার করলে জন্মান্তরবাদও স্বীকার করতেই হয়। কর্মমাত্রই জীবের ভোগ বা বন্ধনের কারণ হওয়ায় জীবের যে সব কর্মের ফলভোগ এই জীবনে হল না অথবা জীবের মৃত্যুর ঠিক পূর্বে সম্পাদিত কর্মফলের ভোগের ব্যাখ্যা দেওয়ার জন্য জন্মান্তরবাদ অবশ্য স্বীকার্য।

কিন্তু কর্ম কীভাবে ফল প্রদান করে, তা এক জন্মেই ফলপ্রদান করে অথবা পরবর্তী কোন জন্মে ফলপ্রদান করে এই বিষয়ে আমরা সকলেই অজ্ঞ। এটিই হল কর্মবাদের রহস্য। যোগসূত্রকার কর্মবাদ সম্পর্কে মোটামুটি একটা রূপরেখা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন, যাতে সাধারণ মানুষ কর্মবাদের রহস্য একটু হলেও বুঝতে পারেন। সেখানে জন্মান্তরের সমর্থনেও আলোচনা রয়েছে। এই ধরনের আলোচনার সার্থকতা এখানেই যাতে কর্মবাদের রহস্য অবগত হয়ে মানুষ পাপমূলক কর্মে লিপ্ত না হয়; কারণ, পাপ বা অধর্মই দুঃখের জনক, যা কোন না কোন জন্মে অনিবার্যভাবে ফলপ্রদায়ী। আসলে আমরা নিজেরাই আমাদের ভবিষ্যতকে তৈরী করি। তাই মানুষ কর্মবাদের বিষয়ে অবগত হয়ে কিছুটা ভীত হয়েই যাতে পাপকর্মে লিপ্ত না হয় তারই প্রচেষ্টা করা হয়েছে।

যোগদর্শনে বলা হয়েছে, কর্মাশয় বা কর্মসংস্কার দ্বিবিধ; যথা ধর্ম ও অধর্ম। চিত্তের কোন ভাব হলে তার যে ছাপ চিত্তে ধরা থাকে, তাকেই সংস্কার বলে। এই সংস্কার আবার দুই প্রকার - সবীজ সংস্কার ও নির্বীজ সংস্কার। সবীজ সংস্কার অজ্ঞানমূলক বা ক্লিষ্টবৃত্তিজনিত হতে পারে, আবার প্রজ্ঞামূলক বা অক্লিষ্টবৃত্তিজনিত হতে পারে। ক্লিষ্টবৃত্তিজ সবীজ সংস্কারই হল কর্মাশয়।

যাইহোক, কাম, লোভ, মোহ, ক্রোধ এই ক্লেশ সকল থেকেই ধর্ম অর্থাৎ পুণ্যকর্মাশয় ও অধর্ম অর্থাৎ অপুণ্যকর্মাশয় উৎপন্ন হয়। এই সকল কর্মাশয়ের কতকগুলি দৃষ্টজন্মবেদনীয়, আবার কতকগুলি অদৃষ্টজন্মবেদনীয়। কর্ম যে জন্মে অনুষ্ঠিত হয়, সেই জন্মেই যদি তার ভোগ বা পরিপাক হয়, তাহলে তা দৃষ্টজন্মবেদনীয় কর্ম। যেমন, তীব্র বিরাগের সাথে আচরিত মন্ত্র, তপস্যা ও সমাধির দ্বারা নির্বর্তিত যে পুন্যকর্মাশয়, অথবা পরমেশ্বর, দেবতা, মহর্ষি ও মহানুভব বা মহাত্মাগণের আরাধনার দ্বারা পরিনিষ্পন্দ যে পুন্যকর্মাশয়, তা সদ্য অর্থাৎ যে জন্মে সম্পাদিত হয়, সেই জন্মেই পরিপাক বা ভোগ উৎপন্ন করায় এগুলি হল দৃষ্টজন্মবেনীয় পূনা কর্মাশয়। আবার, উৎকট অবিদ্যাদি ক্লেশপূর্বক ভীত, ব্যাধিগ্রস্ত, দরিদ্র, শরণাগত অথবা মহানুভব তপস্বীদের প্রতি বারবার অপকার করলে তার থেকে উৎপন্ন যে পাপ কর্মাশয় তাও সদ্য বিপাকগ্রস্ত হয়। অর্থাৎ এটি হল দৃষ্টজন্মবেদনীয় পাপকর্মাশয়ের উদাহরণ। দৃষ্টজন্মবেদনীয় পূন্যকর্মাশয়ের মূর্ত উদাহরণস্বরূপ ভাষ্যকার বালক নন্দীশ্বরের উল্লেখ করেন। রাজকুমার নন্দীশ্বর মহাদেবের উৎকট আরাধনার মাধ্যমে মৃত্যুর পূর্বেই মনুষ্য পরিণাম বা মনুষ্য শরীর ত্যাগ করে দেবশরীর লাভ করেছিলেন। আবার, দৃষ্টজন্মবেদনীয় পাপকর্মাশয়ের মূর্ত উদাহরণ হিসাবে ভাষ্যকার নহুষ রাজার কথা বলেন, যিনি ইন্দ্রপদপ্রাপ্ত হয়েও মহর্ষির শাপবশতঃ দেবত্ব পরিত্যাগ করে তির্যক রূপে অর্থাৎ বৃহৎ অজগর-এ পরিণত হয়েছিলেন। প্রসঙ্গতঃ ভাষ্যকার উল্লেখ করেছেন যে, যারা নারক অর্থাৎ যাদের পাপকর্মাশয়ের ভোগ নরকে হবে, তাদের দৃষ্টজন্মবেদনীয় কর্মাশয় থাকতে পারে না। কারণ, মনুষ্য শরীরের দ্বারা নরকভোগ, যা দীর্ঘকাল ভোগ্য, সম্ভব নয়; ফলতঃ পাপকর্মবশতঃ নারকগণের নরকভোগের জন্য তদুপযোগী শরীরের প্রয়োজন হয়, যা মৃত্যুর পরে অর্থাৎ মনুষ্য শরীরের অবসানের পরেই সম্ভব। আবার, ভাষ্যকার এও উল্লেখ

করেন যে, যে যোগীগণের ক্লেশ সকল ক্ষীণ হয়েছে, তাঁদের সকল কর্মাশয়ই দৃষ্টজন্মবেদনীয়, তাদের অদৃষ্টজন্মবেদনীয় কর্মাশয় নেই, কারণ জীবন্মুক্ত পুরুষ দেহ রাখার পর বিদেহমুক্তি প্রাপ্ত হন।

কর্মফলের ভোগ যে জন্মান্তরেও সম্ভব এইকথার যথার্থতা প্রতিপাদনের জন্যই যোগভাষ্যকার অদৃষ্টজন্মবেদনীয় কর্মাশয়ের অবতারণা করেছেন। কারণ, আমরা অনেকক্ষেত্রেই দেখি যে, দুরাচারী ব্যক্তির জীবন সুখে অতিবাহিত হচ্ছে, পাপীর কষ্টভোগের পরিবর্তে শ্রীবৃদ্ধি হচ্ছে, পুণ্যবান জীবনে দুর্বিসহ কষ্ট ভোগ করছে ইত্যাদি। এইসব দেখে অনেকেরই ধর্মাধর্মের প্রতি অবিশ্বাস জন্মায়। কিন্তু এইরূপ অবিশ্বাস করা উচিৎ নয়; কারণ, পাপ বা পুণ্য উৎকট হলে তবেই তা দৃষ্টজন্মবেদনীয় হয়, অন্যথায় তা জন্মান্তরে ফল প্রদান করে থাকে।

এখন, অবিদ্যাদি পঞ্চক্লেশ থাকলে ধর্মাধর্মরূপ কর্মাশয় ফলারম্ভী হয়, কিন্তু কারণস্বরূপ ঐ ক্লেশসকল উচ্ছিন্ন হলে তা আর হয় না। উপমাস্বরূপ ভাষ্যকার বলেছেন, শালিতণ্ডুল বা ধান্যবীজ তুষের মধ্যে আচ্ছাদিত থাকলেই তা অঙ্কুরোৎপাদনে সমর্থ হয়, কিন্তু অপনীততুষ বা তুষের বিমোক করলে তা থেকে আর অঙ্কুর উৎপন্ন হতে পারেনা। অনুরূপভাবে, ক্লেশযুক্ত হয়েই কর্মাশয় ফলারম্ভী হয়ে থাকে, কিন্তু ক্লেশ অপনীত হলে বা প্রসংখ্যান ধ্যানের দ্বারা ক্লেশবৃত্তি দগ্ধবীজভাব হলে, তা আর ফলজননে সমর্থ হয় না।
যাই হোক, কর্মাশয়ের বিপাক বা পরিণাম ত্রিবিধ; যথা জাতি (মনুষ্যাদি জন্ম), আয়ু (জীবনকাল) ও ভোগ (সুখদুঃখের সাক্ষাৎকার)। আমরা জানি যে, কর্ম মাত্রই তা ফলপ্রদায়ী। এটিই কর্মবাদের মূলকথা। যোগদর্শনেও কর্মবাদ বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। যোগভাষ্যকার কর্মফলসম্বন্ধে বিচার করেছেন। এই প্রসঙ্গে তাঁর প্রথম বিচার্য হল যে, একটি কর্ম (ধর্ম বা অধর্মরূপ) কি একটি জন্মের কারণ হয়? অথবা একটি কর্ম অনেক জন্ম সম্পাদন করে?

ভাষ্যকারের দ্বিতীয় বিচার্য বিষয় হল, অনেক কর্ম কি যুগপৎ অনেক জন্মের কারণ হয়? অথবা অনেক কর্ম একটি জন্মের কারণ হয়?

ভাষ্যকার উক্ত দ্বিবিধ বিষয় আলোচনার মাধ্যমে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হন, তা হল জন্ম ও মরণের মধ্যবর্তী সময়ে ব্যক্তি কর্তৃক যে সকল বিচিত্র কর্ম অনুষ্ঠিত হয়, সেই সকল কর্ম প্রধান ও অপ্রধানভাবে স্থিত মৃত্যুর দ্বারা অভিব্যক্ত হয় এবং সেই পুণ্য ও অপুণ্য কর্মাশয় যুগপৎ মিলিত হয়ে মরণসাধন ক'রে একটিমাত্র জন্ম নিষ্পন্ন করে। এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার জন্য ভাষ্যকার প্রথম বিচার্য বিষয়ের বিকল্প দু'টির খন্ডন করেছেন। তিনি বলেছেন, একটি কর্ম একটি জন্মের কারণ -এই কথা বলা যায় না; কারণ, এইরূপ বললে অনাদিকাল থেকে যেসকল জন্মান্তরীয় সঞ্চিত কর্মের ফলভোগ আবশিষ্ট আছে এবং বর্তমান শরীরে কৃত কর্মের ফলের উৎপত্তির পৌর্বাপর্যের মধ্যে কোন নিয়ম থাকবে না। তার ফলে সাধারণ লোকের ধর্মানুষ্ঠানে আশ্বাস থাকবে না। আবার, একটি কর্ম অনেক জন্মের কারণও হতে পারে না, কারণ অসংখ্য কর্মের মধ্যে একটিমাত্র কর্মই যদি অনেক জন্ম নিষ্পন্ন করে, তাহলে ঐ কর্মটি ব্যতীত অবশিষ্ট কর্মরাশির বিপাক বা ফলভোগ হবে কীভাবে? কাজেই, অবশিষ্ট কর্মের ফলাফল বা বিপাককালের অবসর না হওয়ার কারণে এই বিকল্পটিও বর্জিত হল। এখন যদি প্রশ্ন হয়, অনেকগুলি কর্ম অনেক জন্মের কারণ - একথা বলা যায় কি? ভাষ্যকারের মতে, তাও বলা যায় না, কারণ, অনেক জন্ম একেবারে নিষ্পন্ন হয় না। অর্থাৎ একটি জন্মের পর অপর জন্ম ক্রমে নিষ্পন্ন হয়। কিন্তু একথা বললে পুনরায় আগের মতো দোষ ঘটে। অর্থাৎ কর্মান্তরের বিপাকের সময়াভাবসংক্রান্ত দোষ থেকে এই বিকল্পটিও নিষ্কৃতি পায় না। সুতরাং, পরিশেষানুমানের দ্বারা সিদ্ধ হল যে, অনেক কর্ম একটি জন্ম নিবর্তিত করে। কাজেই ভাষ্যকারের সিদ্ধান্ত হল, কর্মাশয় হল

একভবিক, অর্থাৎ একটি জন্মের কারণ। একটি শরীরের জন্ম ও মৃত্যুর মধ্যবর্তী সময়ে কর্তার দ্বারা যেসব কার্য অনুষ্ঠিত হয়, তারাই প্রধান ও অপ্রধানভাবে অবস্থান করে এবং সেই পুণ্য ও অপুণ্য কর্মাশয় মরণ দ্বারা প্রকাশিত হয় এবং তারা একত্র মিলিত হয়ে মরণসাধনপূর্বক একটিমাত্র জন্ম নিষ্পন্ন করে। এইকথা বললে আর পূর্বের দোষ হয় না; কারণ, এক একটি জন্মে যেমন অনেক কর্ম উৎপন্ন হয়, তেমনি একটি জন্মের দ্বারাও অনেক কর্মের বিপাক অর্থাৎ ক্ষয় হয়ে আয় ও ব্যয় তুল্য হয়ে পড়ে। যে কর্মাশয় জন্ম নিষ্পন্ন করে, সেই জন্ম সেই কর্মাশয়ের দ্বারাই আয়ু লাভ করে এবং ঐ কর্মাশয়ের দ্বারাই ঐ আয়ুতে সুখ ও দুঃখের ভোগ সম্পন্ন হয়। ঐ কর্মাশয় জন্ম, আয়ু ও ভোগের কারণ হওয়ায় তা ত্রিবিপাক বলে বলে কথিত হয়।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, কর্মাশয় যেমন ত্রিবিপাক হয়, তেমনি একবিপাকারম্ভক, আবার দ্বিবিপাকারম্ভবও হয়ে থাকে। দৃষ্টজনাবেদনীয় কর্মাশয় শুধুমাত্র ভোগের (একটি বিপাকের) হেতু হলে তাকে একবিপাকারম্ভক বলে (যেমন, নহুষ রাজার)। আর, দৃষ্টজন্মদেনীয় কর্মাশয় যখন আয়ু ও ভোগ উভয়ের জনক হয়, তখন তাকে দ্বিবিপাকারম্ভক বলে (যেমন, নন্দীশ্বরের আয়ু ছিল মাত্র আটবছর; কিন্তু শিবের বরের দ্বারা তিনি অমরত্ব প্রাপ্ত হন এবং তদুপযুক্ত ভোগ হয় তাঁর)।

কর্মাশয় নিয়ত বিপাক আবার অনিয়ত বিপাক উভয়ই হতে পারে। যেসব কর্মাশয়ের পরিণাম-সময় অবধারিত থাকে, অর্থাৎ যেগুলি নিজের ফল সম্পূর্ণরূপে প্রসব করে, সেগুলি নিয়তবিপাক। আর যেসব কর্মাশয়ের পরিণাম কীভাবে হবে, তা সঠিকভাবে বলা যায় না, সেগুলি অনিয়ত বিপাক। এখন, দৃষ্টজন্মবেদনীয় নিয়তবিপাক কর্মাশয় একভবিক হয়; অর্থাৎ তা সম্পূর্ণভাবে সেই জন্মেই সঞ্চিত হয়। কিন্তু অদৃষ্টজন্মবেদনীয় অনিয়ত বিপাক কর্মাশয়ের পক্ষে একভবিকত্বের ঐ নিয়ম পুরোপুরি খাটেনা; কারণ, অদৃষ্টজন্মবেদনীয় অনিয়ত বিপাক কর্মাশয়ের তিন প্রকার গতি হতে পারে, যথা, প্রথমতঃ বিপাক উৎপন্ন না করেই কৃত কর্মাশয়ের নাশ হতে পারে। যেমন, পাপের দ্বারা পুণ্য নষ্ট হয়, আবার পুণ্যে দ্বারা পাপ নষ্ট হয়। ক্রোধমূলক আচরণের ফলে যে পাপ-কর্মাশয় জন্মায়, তা অক্রোধ অভ্যাসের মতো পুণ্যের দ্বারা বিনষ্ট হয়। সুতরাং, কর্ম করলেই যে তার ফলভোগ অনিবার্য এই কথা ঠিক নয়। দ্বিতীয়তঃ স্বতন্ত্রভাবে ফলপ্রসূ হয় যেসব কর্মাশয় তা হল প্রধান কর্মাশয়, যা ফলদানের জন্য উন্মুখ থাকে। আর, প্রধান কর্মাশয়ের বিপরীত কর্মাশয়, হল অপ্রধান কর্মাশয়, যা স্বাধীনভাবে ফলপ্রসু হয় না, বরং প্রধান কর্মাশয়ের সহকারিভাবে হয়। যেমন, যজ্ঞের ফলে ধর্ম উৎপন্ন হয়। কিন্তু যাগানুকূল হিংসার ফলে যে অল্প পরিমাণ পাপ বা অধর্ম উৎপন্ন হয়, তা যদি ভুলবশতঃ প্রায়শ্চিত্তের দ্বারা উচ্ছেদ করা না হয়, তাহলে যজ্ঞরূপ প্রধান কর্মফলের উদয়ের সময় ঐ অল্প অধর্মেরও বিপাক হয়, ফলে অনর্থ জন্মায়। তবে যজ্ঞের ধর্মজনিত সুখের সমুদ্রস্বরূপ স্বর্গভোগের মধ্যে ঐ সামান্য অধর্মজনিত দুঃখ আগুনের ফুলকির মতো, যা সহজেই সহ্য করা যায়। এই প্রকার প্রধান ও অপ্রধান কর্মাশয়ের সমষ্টিই ভবিষ্যত জন্মের হেতু। কিন্তু প্রধান কর্মাশয়ের সাথে একত্রভাবে অপ্রধান কর্মাশয়ের বিপাক হওয়ায় তার ফল (অপ্রধানের ফল) ক্ষীণভাবে অভিব্যক্ত হয়। এই কারণেই অপ্রধান কর্মাশয় সম্বন্ধে একভবিকত্বের নিয়ম খাটে না। তৃতীয়তঃ অতি প্রবল বা প্রধান কোন কর্মাশয়ের বিপাক হলে তার অন্যরূপ অপ্রধান কর্মাশয় অভিভূত হয়ে থাকে। অর্থাৎ তার ফল তখন হয় না; কিন্তু ভবিষ্যতে নিজের অনুরূপ কর্মের দ্বারা অভিব্যক্ত হলে তার বিপাক হতে পারে। এক্ষেত্রেও এক জন্মের কোন কোন অপ্রধান কর্ম অভিভূত হয়ে থাকে বলে সেইস্থলে একভবিকত্বের নিয়ম অনুসৃত হয় না।

তবে, যোগসূত্রকার একথা বলেছেন যে, জন্ম, আয়ু ও ভোগ পুণ্যের দ্বারা সম্পাদিত হলে সুখের কারণ হয়, এবং পাপের দ্বারা সম্পাদিত হলে দুঃখের কারণ হয়।[৫] সর্বজনপ্রসিদ্ধ এই দুঃখ প্রতিকূল স্বভাব। তবে, যোগীগণ বৈষয়িক সুখকালেও দুঃখের অনুভব করেন; কারণ, তাঁরা বিষয়- সুখকেও দুঃখ বলে মনে করেন।[৬]

(৩)

ন্যায়দর্শনে বলা হয়েছে, দুঃখ দ্বাদশ প্রমেয় পদার্থের অন্তর্গত একাদশ পদার্থ। যে দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তিরূপ অপবর্গ ন্যায়দর্শনের প্রয়োজন, সেই দুঃখের তত্ত্বজ্ঞান লাভও ঐ প্রয়োজনের সহায়ক। বস্তুতঃ যদ্বিষয়ক মিথ্যাজ্ঞান যদ্দুঃখের কারণ, তদ্বিষয়ক তত্ত্বজ্ঞান তদ্দুঃখ নিবৃত্তির কারণ। দুঃখ বিষয়ক তত্ত্বজ্ঞান লাভ হলে তদ্বিষয়ক মিথ্যাজ্ঞান দূরীভূত হবে। দুঃখ বিষয়ক মিথ্যাজ্ঞান এই যে, জীব দুঃখকেও সুখরূপে বোধ করে। আর, দুঃখ বিষয়ক তত্ত্বজ্ঞান হল এই যে, প্রকৃত সুখও দুঃখানুসক্ত হওয়ায় সুখও দুঃখ। দুঃখসম্বন্ধশূন্য কোন জন্ম নেই। তাই দুঃখের উক্ত স্বরূপ মুমুক্ষু বুঝলে তবেই তাঁর দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি হবে। আর দুঃখের এই আত্যন্তিক নিবৃত্তির সাথে অপবর্গ অভিন্ন। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, মহর্ষি দুঃখের লক্ষণে বলেন, "বাধনালক্ষণং দুঃখম্।।" শরীর থেকে ফল পর্যন্ত সকল প্রকার প্রমেয়ই বাধনালক্ষণ, অর্থাৎ দুঃখানুসক্ত হওয়ার দুঃখ। যা মুখ্য দুঃখ, তার সম্বন্ধপ্রযুক্ত সবই দুঃখ এবং সেগুলি হল গৌণদুঃখ। মহর্ষির দুঃখ লক্ষণের দ্বারা মুখ্যদুঃখের লক্ষণের পাশাপাশি গৌণদুঃখের লক্ষণও কথিত হয়েছে বলে ন্যায়মঞ্জরীকার জয়ন্তভট্ট মনে করেছেন। তিনি বলেছেন, লক্ষণস্থিত 'বাধনালক্ষণ' শব্দের দ্বারা মুখ্যদুঃখের লক্ষণ কথিত হয়েছে। অপরদিকে, যা বাধনালক্ষণ অর্থাৎ যা বাধনা বা দুঃখের সাথে অনুষঙ্গবিশিষ্ট, তা হল গৌণ দুঃখ। দুঃখের সাথে সম্বন্ধযুক্ত হওয়ায় জন্মমাত্রই দুঃখ। মুমুক্ষু জন্মে দুঃখদর্শী হয়ে নির্বেদপ্রাপ্ত হল। সুখ ও তার সাধনে কোন প্রয়োজন নেই এরূপ বুদ্ধিই নির্বেদ। নির্বেদ প্রাপ্ত ব্যক্তি বা নির্বিন্ন ব্যক্তির বৈরাগ্য জন্মায়। ভোগাবিষয় উপস্থিত হলেও তাতে বিতৃষ্ণারূপ উপেক্ষাবুদ্ধিই বৈরাগ্য। জন্যে বৈরাগ্য না জন্মালে তা উচ্ছেদের জন্য প্রবৃত্তি হতে পারেনা এবং বৈরাগ্য বাতীত মুক্তি কখনই সম্ভব নয়। যার বৈরাগ্য জন্মেছে, বা যাঁতে বৈরাগ্য উৎপন্ন হয়েছে, তাকে বলে বিরক্ত। বিরক্ত ব্যক্তিই সাধনার ফলে কালে মুক্তিলাভ করে।

আবার, সাংখ্যদর্শনেও বলা হয়েছে, ভোগই ত্যাগের সোপান সৃষ্টি করে। প্রকৃতি তার নিজের উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য সৃষ্টি করে না, প্রকৃতির নিজের কোন উদ্দেশ্য নেই। বরং প্রকৃতি সৃষ্টি করে পুরুষের প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য। পুরুষের প্রয়োজন হল ভোগ ও অপবর্গ। অর্থাৎ ভোগ ও অপবর্গই হল পুরুষার্থ। সুতরাং, পুরুষার্থ সিদ্ধির জন্যই প্রকৃতি ভোগ ও অপবর্গের সৃষ্টি করে। তাই বাচস্পতি মিশ্র বলেছেন, "স্যাদেতৎপুরুষার্থপ্রযুক্তা সৃষ্টিঃ।" প্রকৃতির সৃষ্টি ব্যতীত পুরুষের ভোগ উৎপন্ন হয় না। ভোগ না হলে পুরুষের অপবর্গ হতে পারে না, কারণ অপবর্গ ভোগের পরবর্তী হয়ে থাকে। যেমন পূর্বে বন্ধন স্বীকার না করলে মুক্তির প্রশ্নই অর্থহীন হয়ে যায়, ঠিক তেমনই পূর্বে ভোগ স্বীকার ব্যতীত অপবর্গও অর্থহীন। বস্তুতঃ ভোগের কারণস্বরূপ এই বিশাল সৃষ্টি অপবর্গেরও হেতু। কিন্তু কীভাবে? উত্তর হল, বৈরাগ্য বাতীত অপবর্গ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। অর্থাৎ বৈরাগাই অপবর্গের মুখ্য সাধন। কিন্তু পুনরায় প্রশ্ন হয় যে, বৈরাগ্য অপবর্গের সাধন হয় কীভাবে? উত্তরে বলা যায় যে, পুরুষ দুঃখ পায় বলেই অপবর্গ বৈরাগ্য-সাধন। দুঃখ পুরুষের হয়, আর কৈবল্য বা অপবর্গও পুরুষেরই হয়। দুঃখ প্রাপ্তির মাধ্যমেই পুরুষের বিষয়ের প্রতি বৈরাগ্য বা বিষয়-বিতৃষ্ণা জন্মায়। যে বস্তু দুঃখদায়ক হয়, সেই বস্তুই জিহাসিত হয় এবং সেই বস্তু থেকে চিত্ত বিমুখ হয়, ফলতঃ সেই বস্তুর প্রতি বিতৃষ্ণা বা বৈরাগ্য উৎপন্ন হয়। কাজেই, সৃষ্ট পদার্থকে দুঃখরূপে মনে করাকেই

বৈরাগ্যের উপযোগী বলা হয়েছে। সৃষ্ট পদার্থ মাত্রই দুঃখ হেতুক - এই বিষয়টিকে প্রতিপাদন করার জন্যই ঈশ্বরকৃষ্ণ বলেছেন,

"তত্র জরামরণকৃতং দুঃখম্প্রাপ্নোতি চেতনঃ পুরুষঃ।
লিঙ্গস্যাহ বিনিবৃত্তেস্তস্মাদ্দুঃখং স্বভাবেন।।"[৭]

(৪)

আমরা দেখলাম যে, দুঃখ আছে বলেই আমাদের মুক্তি সম্ভব হয়। এখন, ভূমিকাতেই একটি প্রশ্নের উত্থাপন করেছি যে, জীবের দুঃখই যদি তার মুক্তির সোপান হয়, তাহলে কি একথা বলা যায় যে, পাপ, যা দুঃখের কারণ, তা পরোক্ষভাবে মুক্তির সহায়ক হয়ে থাকে? বিষয়টি ব্যাখ্যার জন্য প্রথমেই উল্লেখ্য যে, ভারতীয় দর্শনে কর্মবাদের আলোচনায় দ্বিবিধ কর্ম স্বীকার করা হয়েছে, যথা প্রারব্ধ কর্ম এবং অনারব্ধ কর্ম। যে কর্মের ফলভোগ আরম্ভ হয়ে গেছে, তা হল প্রারব্ধ কর্ম। অপরদিকে, যে কর্মে ফলভোগ এখনো আরম্ভ হয়নি, তা হল অনারব্ধ কর্ম। এই অনারব্ধ কর্ম আবার, দুই প্রকারের, যথা সঞ্চিত কর্ম, যা পূর্বজীবনে সম্পাদিত এবং সঞ্চীয়মান কর্ম, যা বর্তমান জীবনে সম্পাদিত। এখন, ভারতীয় দার্শনিকগণের মতে, যে কর্মের ফলভোগ আরম্ভ হয়ে গেছে, অর্থাৎ প্রারব্ধ কর্মের ক্ষয় কোনভাবেই সম্ভব নয়। এইপ্রকার কর্মের ফলভোগ অবশ্যম্ভাবী। তবে সঞ্চিত ও সঞ্চীয়মান কর্মের ফলকে অতিক্রম করা যায় বলে অনেক দার্শনিক মনে করেন। যেমন, মীমাংসকগণ মনে করেন, নিত্য-নৈমিত্তিক কর্মের সম্পাদনের মাধ্যমে সঞ্চিত ও সঞ্চীয়মান উভয়প্রকার অনারব্ধ কর্মের ক্ষয় সম্ভব হয়। যে কর্ম প্রত্যহ বা নিত্য করণীয়, তা নিত্যকর্ম। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, নির্মল সলিলে স্নান, প্রাতঃকালীন বন্দনা, সন্ধ্যাবন্দনা প্রভৃতি হল নিত্যকর্ম। আর, যে কর্ম বিশেষ উপলক্ষ্যে করণীয়, তা নৈমিত্তিক কর্ম। অর্থাৎ অন্য ভাষায় বলা যায় যে, কোন ঘটনা ঘটার নিমিত্ত যে কর্ম করণীয়, তা হল নৈমিত্তিক কর্ম। যেমন, পুত্রাদি জন্মের ফলে জাতকর্ম, আত্মীয়বিয়োগের জন্য শ্রাদ্ধকর্ম, সূর্য বা চন্দ্রগ্রহণকালীন গঙ্গাস্নান ইত্যাদি নৈমিত্তিক কর্ম। যদিও এখানে উল্লেখ্য যে, নিত্যকর্ম বিষয়ে ভাট্ট ও প্রাভাকর মীমাংসকগণ একমত হতে পারেননি।[৮] ভাট্টমীমাংসকগণ নিত্যকর্মকে ফলমুখী বলে স্বীকার করেন। অর্থাৎ তাদের মতে, নিত্যকর্ম সম্পাদনের ফলে অতীতের পাপ ক্ষয় হয়; যাকে দূরিত ক্ষয় বলে। আবার, নিত্যকর্মের অসম্পাদনের জন্য যে প্রত্যবায় হওয়ার কথা, নিত্যকর্মের সম্পাদনে সেই প্রত্যবায় থেকে মুক্ত থাকা যায়। কিন্তু প্রাভাকর মতে, নিত্যকর্ম উদ্দেশ্য বা ফলমুখী নয়। অর্থাৎ নিত্যকর্ম কর্তব্যজ্ঞানেই সম্পাদন করা উচিৎ। তা কোনপ্রকার ফলপ্রাপ্তির উপায় নয়, বরং তা লক্ষ্যরূপেই প্রাভাকর মতে বিবেচিত।

প্রসঙ্গতঃ গীতার নিষ্কাম কর্মের কথা উল্লেখ করা যায়। সেখানে জীবকে সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে তুল্যজ্ঞান করে কর্ম করার কথা বলা হয়েছে। বস্তুতঃ ফলাকাঙ্ক্ষা না রেখে কর্ম করাই হল নিষ্কাম কর্ম। তবে, এইপ্রকার কর্ম কিন্তু উদ্দেশ্যহীন নয়। উদ্দশ্য না থাকলে কোন কর্মেই কোন ব্যক্তির প্রবৃত্তি উৎপন্ন হতেই পারে না। আসলে, উদ্দেশ্যহীনতা আর কর্মের ফলের প্রতি উদাসীনতা এক জিনিস নয়। নিষ্কাম কর্মী সকল কর্মফল ভগবানের চরণে সমর্পণ করে থাকেন। ফলতঃ এইপ্রকার কর্মের সম্পাদনের ফলে কর্তার চিত্তশুদ্ধি ঘটে থাকে। শুধু তাই নয়, কর্ম মাত্রই ফলপ্রদায়িনী হলেও নিষ্কাম কর্মের ক্ষেত্রে ফলভোগের কোন প্রশ্নই ওঠে না। সুতরাং, একথা স্পষ্ট যে, জীবের কামনা-বাসনা, লোভ ইত্যাদি দুঃখের কারণ হয়ে থাকে। এই কারণে কামনা-বাসনা দূর করে নিষ্কাম কর্ম সম্পাদনের মাধ্যমে জীব মোক্ষের দিকে এগিয়ে যেতে পারে। বস্তুতঃ নিষ্কাম কর্মই মোক্ষসাধনার প্রথম সোপান। বৈরাগ্যসম্পন্ন অর্থাৎ বিরক্ত ব্যক্তিই নিষ্কাম কর্ম সম্পাদনে সমর্থ

হয়। নিষ্কাম কর্ম সম্পাদনের মাধ্যমে জীবের চিত্তশুদ্ধি ঘটে। ফলে জীব বিশুদ্ধ চিত্তে শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনের মাধ্যমে মোক্ষলাভে সমর্থ হয়। সুতরাং, দুঃখই জীবের আধ্যাত্মিকতার বা মুক্তির পথ উন্মোচন করে থাকে।

তথ্যসূত্র :

১. অরিন্দম চক্রবর্তী, মননের মধু, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০১৪, গাঙচিল, কলকাতা, পৃ - ১৫৭।
২."দুঃখ-জন্ম-প্রবৃত্তি-দোষ-মিথ্যাজ্ঞানানামুত্তরোত্তরাপায়ে তদনন্তরাপায়াদপবর্গঃ"।। - ন্যায়সূত্র ১।১।২॥
৩. ন্যায়সূত্র ১।১।২১।।
৪, অন্নংভট্ট তর্কসংগ্রহ-দীপিকা সহিত - শ্রী পঞ্চানন শাস্ত্রী অনুদিত, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, প্রথম সংস্করণ, কলকাতা, ১৩৯২ বঙ্গাব্দ, পৃ - ২১০।
৫. "তা হ্লাদপরিতাপফলাঃ পুণ্যহেতুত্বাৎ।' - যোগসূত্র ২।১৪।।
৬. "যথা চেদং দুঃখং প্রতিকূলাত্মকং এবং বিষয়সুখকালেঽপি দুঃখমস্ত্যেব প্রতিকূলাত্মকং যোগিনঃ।।" - যোগসুত্রভাষ্য ২।১৪।।
৭. সাংখ্যকারিকা ৫৫॥
৮. এম.হিরিয়ন্না, আউটলাইনস্ অফ ইন্ডিয়ান ফিলসফি, মোতিলাল বানারসীদাস, দিল্লী, ২০০৯, পৃ - ৩৩০।